সম্পর্ক, মিশ্রণ ও নতুন ধারণা : সুলতানি আমল ও বাংলা

প্রিয় শিক্ষার্থীরা, ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান পাঠের অংশ হিসেবে তোমরা নতুন নতুন অনেক কিছুই শিখছ। এসব শিখতে গিয়ে পুরোনো দিনের অনেক বিষয় এবং তথ্য জানতে পেরে নিশ্চয়ই অনেক অবাক-ও হচ্ছো! অবাক হওয়াটাই স্বাভাবিক। কারণ বড় বড় শিক্ষাবিদ এবং জ্ঞানী ব্যক্তি যারা ইতিহাস নিয়ে কাজ করেন, তারাও ইতিহাস পড়তে গিয়ে, ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে ঠিক তোমাদের মতোই অবাক হন। কেন অবাক হন জানো? কারণ, আমরা প্রত্যেকেই বাস করি নিজ নিজ সময়ে, বর্তমানে। আর বর্তমানে থেকে যখন অতীতের কোনো বিষয় নিয়ে পড়তে যাই তখন দেখা যায়, এখনকার অনেক কিছুর সাথেই অতীতের কোনো মিল নেই। একই বিষয় বা ধারণা অতীতে ছিল এক রকম আর পরবর্তী সময়ে হয়ে যায় অন্যরকম।

একটু গোলমেলে ঠেকছে, তাই না? একটা উদাহরণ দিয়ে বললেই খুব সহজে বুঝতে পারবে। তোমাদের যদি জিজ্ঞেস করি, 'বিদেশি' বলতে তোমরা কাদের বোঝাবে? তোমরা চোখ বন্ধ করে বলবে, বিদেশি হলো তারাই যারা আমাদের দেশ অর্থাৎ বাংলাদেশের বাইরে থেকে এই দেশে এসেছে। তোমাদের উত্তর একদম সঠিক। কিন্তু সুলতানি আমলে যদি কাউকে যদি জিজ্ঞেস করা হতো 'বিদেশি' কে? তাহলে সে কী বলত জানো? সে বলত, অপরিচিত কোনো ব্যক্তি যে আমাদের গ্রামে বা অঞ্চলে থাকে না, আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতির অংশ নয়, সেই বিদেশি। আবার ধরো, তোমাদের উত্তরে তোমরা বললে, বাংলাদেশের বাইরে থেকে যারা আসবে তারাই বিদেশি। এখন এই বাংলাদেশ বলতে তোমরা যে ভূখণ্ডকে বুঝছো, তা কি সবসময় একই রকম ছিল? না, একই রকম ছিল না। একেক সময়ে বাংলা অঞ্চল ছিল একেক রকম। সময়ের সাথে সাথে রাজনৈতিক ও ভৌগলিক কারণে অঞ্চল বা দেশের সীমানাও পাল্টে যায়, বদলে যায় মানচিত্র। মানচিত্রের কথা যখন এলোই, চলো সুলতানি আমলের বাংলার একটি মানচিত্র দেখে আসি।

যিনি মানচিত্র তৈরী করেন তাকে মানচিত্রকার বা Cartographer বলা হয়

সময়ের সাথে সাথে সম্পর্ক, চিন্তারও বদল হয়। আর এই বদলে যাওয়াটা ভাষা, শব্দ, সংস্কৃতি, অভ্যেস, জীবন-যাপন থেকে শুরু করে সবকিছুর উপরই প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু কথা হলো এই বদলে যাওয়ার সাথে আমাদের আজকের পাঠের সম্পর্ক কোথায়? বন্ধুরা, আমাদের আজকের পাঠের শিরোনাম 'সম্পর্ক, মিশ্রণ ও নতুন ধারণা : সুলতানি আমল ও বাংলা'। পাঠের শিরোনাম পড়ে তোমরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে ধরে ফেলেছ যে, সুলতানি আমলে বাংলা অঞ্চলে মানুষে-মানুষে সম্পর্ক কেমন ছিল, একে অপরের সাথে বা এক অঞ্চলের মানুষ অন্য অঞ্চলের মানুষের সাথে কীভাবে মিশত এবং এই মিশতে গিয়ে কী কী নতুন ধারণা বা বিষয়ের সাথে পরিচিত এবং অভ্যস্থ হতো, সেসব নিয়েই আমরা আলোচনা করব। আর এই আলোচনার বড় অংশ জুড়েই থাকবে বদলে যাওয়া ইতিহাস, সংস্কৃতি, মিশ্রণ এবং নতুন ধারণার উৎপত্তি। বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করতে চলো আমরা সুলতানি আমলের একটি মানচিত্র দেখে আসি। তবে শুরুতেই খুব সংক্ষেপে সুলতানি আমলের সময়কাল এবং এসময়ের সাধারণ কিছু তথ্য জানা থাকলে পরের আলোচনাগুলো করতে আমাদের সুবিধা হবে।

কোন সময়কে সুলতানি আমল বলা হয়?

বন্ধুরা ষষ্ঠ শ্রেণির ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ে তোমরা জেনেছ যে, ভারতীয় উপমহাদেশে পাল ও সেন আমলকে ইতিহাসের প্রাচীন যুগ বলে অভিহিত করা হয়। এই পাল এবং সেন রাজবংশ দ্বাদশ শতাব্দি পর্যন্ত শাসন করে। মূলত এর পরই উপমহাদেশে সুলতানি আমল শুরু হয়। সুলতানি শাসন দিয়েই আমাদের এই অঞ্চলের ইতিহাস মধ্যযুগে প্রবেশ করে। সুলতানরা ১২০৪ সাল থেকে ১৫২৬ সাল পর্যন্ত উপমহাদেশ শাসন করেন। মোগল সাম্রাজ্যের উত্থানের মাধ্যমে উপমহাদেশে সুলতানি আমলের সমাপ্তি ঘটে। সুলতানি শাসনের প্রধান ব্যক্তিকে বলা হতো 'সুলতান'। রাষ্ট্রের সব ক্ষমতা এই সুলতানের কাছেই থাকত। সুলতানি শাসনামলেই সর্বপ্রথম 'কেন্দ্রিভূত শাসনব্যবস্থা' চালু হয়।

সুলতানি আমলের সময়কাল

উত্থান ১২০৪ সালে

পতন ১৫২৬ সালে

কেন্দ্রিভূত শাসনব্যবস্থা

তোমাদের মনে নিশ্চয়ই এবার নতুন প্রশ্ন এসেছে যে, এই 'কেন্দ্রিভূত শাসব্যবস্থা' জিনিসটা আবার কী? এটা খুব সহজ একটা বিষয়। এখন যেমন আমরা বাংলাদেশের নাগরিক। এই দেশের সবকিছু শাসন করা হয় কেন্দ্র অর্থাৎ ঢাকা থেকে। ঢাকাতে একটি সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। সরকারে একটি মন্ত্রীসভা আছে, আইন বিভাগ আছে, শাসন বিভাগ আছে, প্রশাসনিক ব্যবস্থা আছে। এছাড়া আরও রয়েছে বিভিন্ন অঙ্গ এবং সংস্থা। এদের মাধ্যমেই এই কেন্দ্র অর্থাৎ ঢাকা থেকে পুরো দেশের আইন-শুঙ্খলা, প্রশাসন, বিচার-সহ সকল কাজ নিয়ন্ত্রণ বা দেখাশোনা করা হয়। এটাই হলো কেন্দ্রিভূত শাসনব্যবস্থা। কিন্তু আগে কিন্তু এমন ছিল না। তখন একেকটি অঞ্চল শাসন করত একেকজন। তারা তাদের মতো করেই তাদের অঞ্চল শাসন করত। সুলতানি আমলেই সর্বপ্রথম অনেকগুলো অঞ্চল নিয়ে একটি সাম্রাজ্য গড়ে তোলা হয়। আর সেই সাম্রাজ্য কেন্দ্র অর্থাৎ দিল্লী থেকে শাসন করা হতো। এই জন্য সুলতানি আমলকে বলা হয় 'কেন্দ্রিভূত শাসনব্যবস্থা'-এর প্রথম প্রচলনকারী।

সুলতানি শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

তোমরা তো আগেই জেনেছে, সুলতানি আমলের আগে এই অঞ্চলে পাল ও সেন শাসকগণ শাসন করতেন। কিন্তু সুলতানরা ছিলেন মুসলিম। তাই নতুন শাসকগণ ক্ষমতায় এসে দেশের আইন-কানুন এবং বিচার ব্যবস্থা পুরোটা পাল্টে ফেললেন। এই আমলে শরীয়ত অনুসারে দেশ পরিচালিত হতো। কিন্তু শাসনব্যবস্থা মোটেও ধর্মতান্ত্রিক ছিল না। বৃহত্তর জনগোষ্ঠী যেহেতু অমুসলিম ছিল, তাই স্বাভাবিকভাবেই সবাই সবসময় সুলতানদের শাসন মেনে নিতে চাইত না। ফলে সুলতানগণ অমুসলিম জনগোষ্ঠীর ধর্ম পালনে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, দিল্লী সালতানাতের অমুসলমান প্রজাদেরকে সুলতানরা 'জিম্মি' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। অর্থাৎ, সুলতানি শাসনামলে সকল অমুসলমান প্রজাদের জান-মাল, সম্পত্তি, সম্মান সবকিছু রক্ষা করার দায়িত্ব ছিল প্রশাসনের।

সুলতানগণ ছিলেন সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। এখন মনে হতে পারে, 'সার্বভৌম ক্ষমতা' আবার কী? বন্ধুরা, সার্বভৌম ক্ষমতা হলো সর্বময় ক্ষমতা। যে ব্যক্তি এই ক্ষমতার অধিকারী তারা তাদের ক্ষমতার জন্য কারও কাছে জবাবদিহিতা করতে হয় না। তার ইচ্ছাতেই সবকিছু হয়। তিনি যেমন চান, তেমনই হয়। তারা নিজেদের নামে মুদ্রা চালু করতেন। আর এই মুদ্রা চালু করাকেই সার্বভৌমত্বের প্রতীক হিসেবে দেখা হতো। মুদ্রার কথা যখন চলেই এলো, তাহলে চলো এখন আমরা সুলতানি আমলে প্রচলিত কিছু মুদ্রার ছবি দেখে আসি।

১২৪৬-১২৬৬ সালে সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদের সময়কালে প্রচলিত একটি মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ

১২৬৬-১২৮৭ সালে সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবানের সময়কালে প্রচলিত একটি মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ

১২৯৬-১৩১৬ সালে সুলতান আলাউদ্দিন মুহাম্মদ খিলজির সময়কালে প্রচলিত একটি মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ

১৩২৫-১৩৫১ সালে সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলকের সময়কালে প্রচলিত একটি মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ

তোমাদের জন্য মজার কাজ

তোমাদের জন্য এবার থাকছে একটি মজার খেলা। তোমরা তোমাদের পরিবারের বড় সদস্য কিংবা আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ কিংবা অন্য যেকোনো দেশে প্রচলিত কিছু মুদ্রা সংগ্রহ কর। মুদ্রাটির উপর একটি সাদা কাগজ রেখে এবার কাগজের উপর হাত দিয়ে হালকা করে চাপ দাও। তারপর একটি পেন্সিল দিয়ে কাগজের উপর আলতোভাবে ঘষতে থাকো। দেখবে কাগজের নিচে থাকা মুদ্রার ছাপ কাগজের উপর ভেসে উঠেছে। এভাবে মুদ্রাটির দুইপাশ পেন্সিলের সাহায্যে কাগজে ছাপ দিয়ে সেই ছাপের পাশে মুদ্রাগুলোর মান, গায়ে অঙ্কিত সাল এবং অন্যান্য তথ্যসমূহ লিপিবদ্ধ করে শ্রেণিশিক্ষককে দেখাও।

এক নজরে সুলতানি শাসনব্যবস্থা

- সকল ক্ষমতার উৎস সুলতান
- কেন্দ্রিয় শাসনব্যবস্থা
- শাসন পরিষদ কয়েকটি বিভাগ নিয়ে গঠিত
- প্রত্যেক শহরে বিচারকাজ পরিচালনা করতেন একজন কাজী
- রাষ্ট্রীয় প্রধান আয়ের উৎস ছিল ভূমিকর
- প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার প্রচলন

উপমহাদেশের ইতিহাসে প্রথম নারী শাসক

তোমরা হয়তো সাম্প্রতিক সময়ের রাজনৈতিক ইতিহাস থেকে অথবা নিজ অভিজ্ঞতা থেকে জানতে পেরেছ যে, আমাদের এই ভারতীয় উপমহাদেশে বেশ কয়েকজন নারী রাজনীতিবিদ দেশ শাসন করেছেন। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ের এসব নারী রাজনীতিবিদগণের দেশ শাসনের বহু আগে সুলতানি আমল সর্বপ্রথম নারী শাসক পেয়েছিল। তাঁর নাম ছিল রাজিয়া সুলতানা। তিনি দিল্লী সালতানাতে আরোহণকারী প্রথম নারী সুলতান। পিতা সুলতান ইলতুৎমিশ মারা যাওয়ার পর তাঁর কন্যা হিসেবে তিনি ১২৩৬ থেকে ১২৪০ সাল পর্যন্ত দিল্লী সালতানাতের দায়িত্ব পালন করেন। শাসক হিসেবে রাজিয়া সুলতানার সুনাম বেশ প্রসিদ্ধ ছিল। তিনি সুলতানের পোশাক পরে দরবারে উপস্থিত হতেন। যুদ্ধশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী সুলতানা রাজিয়া যুদ্ধের মাঠে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি নিজ নামে মুদ্রাও প্রচলন করেন।

সুলতানা রাজিয়ার আমলে প্রচলিত দুটি মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ

ইতিহাসবিদ এবং তাদের উৎস অনুযায়ী তৎকালীন সমাজব্যবস্থা

তোমরা তো জানোই ইতিহাস নিয়ে যারা পড়াশোনা করেন, গবেষণা করেন, তাদের ইতিহাসবিদ বলে। সে হিসেবে তোমরাও একেকজন খুদে ইতিহাসবিদ। একদিন তোমরাও নিশ্চয়ই বড় ইতিহাসবিদ হবে। বড় ইতিহাসবিদ হওয়া অনেক সাধনার ব্যাপার। কারণ বড় ইতিহাসবিদ হতে গেলে যে সময়ের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করতে চাইছেন সে সময়কাল এবং অনুসন্ধানের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে অতীত সম্পর্কে জানতে বিভিন্ন ধরণের উৎস ব্যবহার করেন। তোমরা সুলতানি আমলের ইতিহাস অধ্যয়নকালে ইতিহাসবিদদের ব্যবহৃত উৎসগুলি হতে নানাবিধ তথ্য জানতে পারবে। ইতিহাসবিদদের গবেষণা অনুযায়ী, এ সময়ে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মাবলম্বীর মানুষ বসবাস করলেও মুসলমানগণ অনেক বেশি সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল। আর এর কারণ কিন্তু একটু আগেই বলা হয়েছে। সেই কারণটা মনে আছে তো? আচ্ছা, কারণটা আরেকবার মনে করিয়ে দিচ্ছি। সুলতানি আমলের শাসকগণ সবাই ছিলেন মুসলিম এবং সে জন্যই মুসলিমরা অন্যদের থেকে সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল। মুসলমান সমাজে মূলত দুইটি শ্রেণী ছিল। একভাগে ছিল বাইরে থেকে আসা অভিজাত সম্প্রদায় যাদের মধ্যে আফগান, ইরানি, তুরানি, আরব ও তুর্কি থেকে আগত লোকজন ছিল। এই বহিরাগত সম্প্রদায় নিজেদেরকে বিজেতা মনে করতেন এবং শেখ, সৈয়দ, গাজীসহ নানা পদবীতে পরিচিত করতেন। অন্যভাগে ছিল স্থানীয় ধর্মান্তরিত সাধারণ শ্রেণী। অভিজাত শ্রেণী নিজেদের আশরাফ ও অন্যদের আতরাফ মনে করতেন। আশরাফ ও আতরাফদের মধ্যে মেলামেশা, বিয়েশাদী, দাওয়াতের আদানপ্রদান একেবারেই ছিল না। বর্তমানেও এ ধরনের বিভাজন আমরা দেখতে পাই। সমাজের ‘দলিতদেরকে’ অন্ত্যজ ও অপাংক্তেয় মনে করা হয়।

কিন্তু আমরা জানি, সমাজের বর্তমান এ ধারণা তোমরাই একদিন ঠিক করবে। তোমরা কাউকে ছোট করে দেখবে না, কাউকে হেয় করবে না। পরিচয়, পেশা, শ্রেণি, শিক্ষা, কাজের ধরন, পোশাক, কথা বলা, ভিন্ন সমাজ-সংস্কৃতি ইত্যাদি কোনো কারণেই কাউকে আলাদা মনে করবে না। কারণ, একটা বিষয় সবসময় মনে রাখতে হবে, ভিন্নতা আছে বলেই আমাদের পৃথিবীটা এত সুন্দর। একবার ভেবে দেখো, পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ প্রজাতির ভিন্ন গাছ না থেকে যদি শুধু এক প্রকারের গাছ থাকত তবে কি পৃথিবী এখনকার মতো এত সুন্দর লাগত? তাই, ভিন্নতাকে, বৈচিত্রতাকে আমাদের সবসময় সমান চোখে নিজেদের মতো করেই দেখতে হবে। আমাদের আজকের সমাজে হয়তো তোমরা এর চর্চা পুরোপুরিভাবে পাচ্ছ না, কিন্তু আমরা জানি, তোমাদের হাত ধরেই বৈচিত্র্যতাকে বরণ করে নেয়ার সুন্দর সংস্কৃতি আমাদের দেশে চালু হবে।

তোমাদের জন্য মজার কাজ

বাংলাদেশে বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর বাইরেও রয়েছে আরও জাতিগোষ্ঠী, যারা নিজ নিজ সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে আমাদের এই দেশকে আরও সুন্দর আর বৈচিত্র্যময় করে তুলছে। এবার তোমরা ভেবে এমন ৫টি জাতিগোষ্ঠীর নাম এবং তাদের একটি উৎসবের নাম লেখ। তোমাদের সুবিধার জন্য একটি করে দেখানো হলো।

বাংলাদেশের বৈচিত্র্যময় জাতিগোষ্ঠীর নাম	তাদের উৎসবের নাম
মারমা	সাংগ্রাই

বাংলাদেশের মানুষের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের পরিচয় তো পেলে। কিন্তু তোমরা তো ইতোমধ্যে জেনেছো যে এই বৈচিত্র্য সৃষ্টির পেছনে ভূমিরূপের বৈচিত্র্য একটা বড় ভূমিকা পালন করে। মানুষের জীবন-যাপন অনেকাংশেই প্রভাবিত হয়ে তার আশেপাশের প্রকৃতি বা ভূমিরূপের মাধ্যমে। চলো আমরা বাংলাদেশের ভূমিরূপের বৈচিত্র্যের সাথে পরিচিত হই।”

বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি

তোমরা তো জানো আমাদের বাংলাদেশ একটি ব-দ্বীপ। বাংলাদেশের উত্তর পূর্ব এবং দক্ষিন পূর্বের কিছু অংশ ছাড়া পুরো বাংলাদেশই প্রধানত সমতল ভূমি। সময়ের সাথে বাংলাদেশে তৈরি হয়েছে বিভিন্ন ধরণের ভূমিরূপ।

বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে সৃষ্ট এসব ভূ-প্রকৃতিকে প্রধানত ৩ টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

১। টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ

২। প্লাইস্টোসিন কালের সোপানসমূহ

৩। সাম্প্রতিক কালের প্লাবন সমভূমি

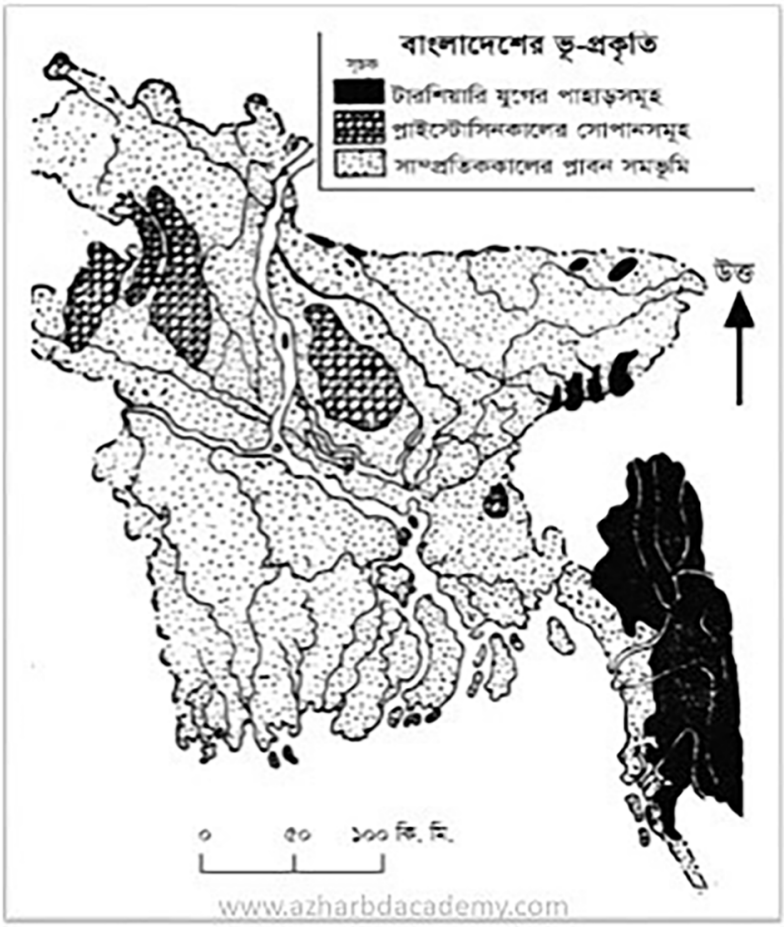

মানচিত্র

(১) টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ

বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন ভূমিরূপ এই টারশিয়ারি যুগের পাহাড় গুলো। প্রায় ২০ লক্ষ বছর পূর্বে টারশিয়ারি যুগে হিমালয় পর্বত সৃষ্টির সময় এই পাহাড় গুলো সৃষ্টি হয়েছিলো। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে টারশিয়ারি যুগের পাহাড় সমূহ দেখা যায়। দক্ষিণ-পূর্বে রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলার পূর্ব দিকে এ ধরণের পাহাড় রয়েছে। পাহাড় গুলোর গড় উচ্চতা ৬১০ মিটার এবং বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ তাজিংডং (বিজয়) এর অবস্থানও এ অঞ্চলে। যার উচ্চতা ১২৩১ মিটার।

উত্তর-পূর্বে সিলেট জেলার উত্তর ও উত্তর-পূর্বাংশে এবং মৌলভীবাজারের উত্তর ও উত্তর-পূর্বাংশ, হবিগঞ্জ জেলার দক্ষিণের পাহাড়গুলো এবং ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা জেলার উত্তরাংশের পাহাড়গুলো এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এখানকার পাহাড়গুলোর গড় উচ্চতা প্রায় ২৪৪ মিটার। উত্তরের পাহাড়গুলোকে স্থানীয়ভাবে টিলা বলে যাদের গড় উচ্চতা ৩০ থেকে ৯০ মিটার। বাংলাদেশের মোট ভূমির প্রায় ১২ ভাগ জুড়ে আছে এই টারশিয়ারি যুগের পাহাড় গুলো।

(২) প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ

আনুমানিক ২৫,০০০ বছর আগে উত্তর-পশ্চিমাংশের বরেন্দ্রভূমি (রাজশাহী, বগুড়া, জয়পুরহাট, নওগাঁ, রংপুর ও দিনাজপুর জেলার কিছু অংশ নিয়ে বরেন্দ্রভূমি গঠিত। বরেন্দ্রভূমি প্লাইস্টোসিন যুগের সর্ববৃহৎ উঁচুভূমি) মধ্যভাগের মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় (টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ জেলায় মধুপুর এবং গাজীপুর জেলায় ভাওয়ালের গড় অবস্থিত।) এবং কুমিল্লা জেলার লালমাই এলাকায় এ অঞ্চল গড়ে ওঠে। বাংলাদেশের মোট ভূমির প্রায় ৮ ভাগ এলাকা নিয়ে এ অঞ্চল গঠিত।

(৩) সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি

আমরা তো জানি বন্যার পানিতে প্রচুর পলি মাটি থাকে, আর বছরের পর বছর এই বন্যার পানির সঙ্গে আসা পলি মাটি জমে জমে প্লাবন সমভূমি গঠিত হয়েছে। বাংলাদেশের প্রায় ৮০ ভাগ ভূমিই সমভূমি । আর পলি মাটি দিয়ে তৈরি হয়েছে বলে এ ধরণের ভূমি খুবই উর্বর। ঢাকা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, জামালপুর, কুমিল্লা, সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার অধিকাংশ এবং কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলার পূর্বদিকে সামান্য অংশ ,পাবনা ও রাজশাহী অঞ্চলের অংশবিশেষ, চাঁদপুর, কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অধিকাংশ এবং লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী, ফেনী ও হবিগঞ্জ জেলার কিছু অংশ জুড়ে এ সমভূমি বিস্তৃত। যশোর, কুষ্টিয়া, খুলনা, ফরিদপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী ও ঢাকা অঞ্চলের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত সমভূমিকে ব-দ্বীপ সমভূমি বলে। নোয়াখালী ও ফেনী নদীর নিম্নভাগ থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত বিস্তৃত উপকূলীয় সমভূমি। খুলনা ও পটুয়াখালী অঞ্চল এবং বরগুনা জেলার কিছু অংশ নিয়ে স্রোতজ সমভূমি গঠিত।

তাহলে আমরা দেখলাম বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ এবং প্লাইস্টোসিন কালের সোপানসমূহ এবং সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি গড়ে ওঠার সময়ও যেমন একই নয় আবার ভূমির গঠনেও রয়েছে বেশ কিছু পার্থক্য।

সুলতানি আমলে হিন্দু সমাজে বর্ণভেদ প্রথা অত্যন্ত কঠোর ছিল। তোমরা হয়তো জিজ্ঞেস করবে বর্ণভেদ প্রথা কী? হিন্দু বা সনাতন ধর্মাবলম্বীগণদের মধ্যে ৪ ধরনের বর্ণ প্রচলিত ছিল। এগুলো হলো ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রীয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এদের মধ্যে ব্রাহ্মণগণ ছিলেন সবার উপরে। তারা পূজা-অর্চণা করতেন। ক্ষত্রীয়রা ছিল যোদ্ধা। বৈশ্যগণ কৃষিকাজ ও ব্যাবসা করে জীবিকা নির্বাহ করত। আর সমাজের সবচেয়ে নিচের অংশে অবস্থান করত শুদ্ররা। তারা কামার, কুমার, মুটে, দিনমজুর, মেথর ইত্যাদি পেশায় নিয়োজিত ছিল। হিন্দু সমাজের বাকিদের কাছে শুদ্ররা ছিল অত্যন্ত নীচ। তারা সবার থেকে আলাদা থাকত। তাদের সাথে কেউ মিশত না। তৎকালীন হিন্দু সমাজে বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ এবং সতীদাহ প্রথা চালু ছিল। তোমরা যখন আরেকটু বড় হবে তখন জানতে পারবে, সুলতানি আমল ও মোগল আমল শেষ হবার পর ব্রিটিশ উপনিবেশ আমলেও হিন্দু সমাজে এই ধরনের বর্ণভেদ প্রথা, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ এবং সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু এই ব্রিটিশ উপনিবেশকালেই হিন্দুদের মধ্যকার কয়েকজন মহান ব্যক্তির চেষ্টায় সমাজ থেকে বর্ণভেদ প্রথা, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ এবং সতীদাহ প্রথা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়। এই মহান ব্যক্তিদের মধ্যে কারও কারও নাম হয়তো তোমরা শুনেও থাকবে। এঁদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা করে একটু বড় ক্লাসে উঠলেই সমাজ পরিবর্তনে এই মহান ব্যক্তিদের অদ্ভুত সব গল্প তোমরা জানতে পারবে।

একনজরে হিন্দু সমাজের প্রথাসমূহ

বর্ণভেদ প্রথা : হিন্দু সমাজের ৪টি বর্ণের মধ্যে ভেদাভেদ প্রথা

বহুবিবাহ : একজন পুরুষের একাধিক বিয়ের প্রথা

বাল্যবিবাহ : তৎকালীন সময়ে মেয়ে শিশুদের বয়স ১২-এর আগেই বিয়ে দিয়ে দেওয়া রীতি, বর্তমানে এ বয়সসীমা ১৮ বছর।

সতীদাহ : স্বামীর মৃত্যুর সাথে সাথে স্ত্রীকেও একই চিতার আগুনে সহমরনে যেতে বাধ্য করা

অমানবিক দাসপ্রথা

এখন যে কথাগুলো পড়তে যাচ্ছ, তা হয়তো পড়তে তোমাদের ভালো লাগবে না। কিন্তু ইতিহাস তো শুধু ভালো নিয়েই কাজ করে না, বরং মন্দকে জানার মাধ্যমে ভবিষ্যতের জন্য দিক-নির্দেশনা দেয়াও ইতিহাসের কাজ। তাই ইতিহাসের এই মন্দটুকুও তোমাদের জানতে হবে। সুলতানি আমলে সমাজের বিভিন্ন স্তরে দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। তোমরা হয়তো জানতে চাইতে পারো দাসপ্রথা কী? দাসপ্রথা হলো অমানবিক একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে বাজারে আনুষ্ঠানিকভাবে মানুষের কেনা-বেচা হতো। এই ব্যবস্থায় ধনীরা ব্যক্তিকে কিনে নিত এবং ক্রীত ব্যক্তি তার সম্পত্তি হিসেবে যেকোনো কাজ করতে বাধ্য থাকত। সুলতানি আমলেও এই দাসপ্রথার মাধ্যমে মানুষের কেনা-বেচা হতো। দাসগণ অত্যন্ত মানবেতর জীবনযাপন করত। তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো মূল্য ছিল না। সুলতানি আমল ও মোগল আমল শেষে ব্রিটিশ উপনিবেশের মধ্যমভাগে আইন করে এই অমানবিক প্রথা নিষিদ্ধ করা হয়।

সুলতানি আমলে নারীর অবস্থা

নারীদের অবস্থা ও সম্মান অন্য সব সময়ে যেমন ছিল সুলতানি আমলেও তার ব্যতিক্রম ছিল না। তাদের অবস্থান পুরুষের অনেক নীচে থাকত। অধিকাংশক্ষেত্রেই নারীরা স্বামী কিংবা পুত্রের উপর নির্ভরশীল ছিল। সন্তান ধারণ এবং গৃহস্থালী কাজের বাইরে তাদের অন্য কোনো কাজে সম্পৃক্ততা সেই অর্থে ছিল না। সমাজের ধনী শ্রেণির নারীদের মধ্যে কেউ কেউ কাব্যচর্চা বা সাহিত্য চর্চা করার নজির অবশ্য সুলতানি আমলে পাওয়া যায়। তবে তার সংখ্যা কুবই সামান্য। নিম্নবর্গের সমাজে নারীরাও পুরুষের সাথে তাল মিলিয়ে মাঠেঘাটে কৃষিকাজ থেকে শুরু করে অন্যান্য কাজ করত।

সুলতানি আমলের অর্থনৈতিক অবস্থা

দিল্লী সালতানাতের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে সেই সময়ের কিছু লেখক যেমন মিনহাজ-ইস-সিরাজ, জিয়াউদ্দিন বারণি, শামস্-ই-সিরাজেএর লেখা থেকে অনেক কিছুই জানা যায়। কিন্তু অর্থনৈতিক অবস্থা জানার জন্য সুলতানি আমলে বহিরাগত পর্যটকদের লেখা বিবরণী ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না। তোমাদের নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে করছে পর্যটক আবার কারা?

পর্যটক কারা?

পর্যটক হলো তারাই যারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সীমানা, সংস্কৃতি, মানুষ, ইতিহাস, জীবনযাপন, অভ্যেস, শিক্ষা ইত্যাদি জানার জন্য এক দেশ থেকে আরেক দেশে ঘুরে বেড়ান। তারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়ান। বেড়াতে বেড়াতে তারা বিভিন্ন জায়গার সমাজ-সংস্কৃতি দেখেন, অধ্যয়ন করেন, পরের প্রজন্মকে জানানোর জন্য তা আবার কখনো কখনো লিখেও রাখেন। বন্ধুরা, চাইলে তোমরাও কিন্তু পর্যটক হতে পারো। ভাবছ কীভাবে পর্যটক হবো। তারা তো দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়ায়। না বন্ধুরা। পর্যটক হতে হলে শুধু বিদেশেই ঘুরতে হবে এমন কোনো কথা নেই। দেশের ভেতরে থেকেও পর্যটক হওয়া যায়। তোমরা প্রতিবছরই পরিবারের সদস্যদের সাথে দেশের ভেতরেই বিভিন্ন জায়গায় নিশ্চয়ই ঘুরতে যাও। এই ঘুরতে যাওয়াটাকেই তোমরা কাজে লাগাতে পারো। এর পর থেকে তোমরা নতুন যে স্থানেই ঘুরতে যাবে, সেখানে গিয়ে ওই জায়গার মানুষদের ভাষা, জীবনযাপন, সংস্কৃতি, উদযাপন, উৎসব, বিনোদন, শিক্ষা ইত্যাদি খুব ভালো করে পর্যবেক্ষণ করবে। প্রয়োজনে ঘুরতে যাবার সময় পকেটে ছোট একটি নোট খাতা আর কলম রাখবে। যা দেখবে তাই তখন তখনই ছোট করে টুকে রাখবে। সাথে দিন-তারিখ আর স্থানের নাম লিখে রাখতে ভুলে যেয়ো না আবার। তারপর বাড়িতে ফিরে সেগুলো একটু সুন্দর করে একটি খাতায় লিখে রাখবে। ব্যস তুমিও হয়ে গেলে পর্যটক।

এবার আমি পর্যটক

বন্ধুরা, চলো এবার তাহলে মজার একটা কাজ করি। তোমরা কোথায় কোথায় ঘুরতে গেছ সে জায়গাগুলোর নাম লিখে ফেল। তার সেখানকার মানুষদের ভাষা, জীবনযাপন, সংস্কৃতি উদযাপন, উৎসব, বিনোদন, শিক্ষার অবস্থা কেমন দেখেছ তা নিয়ে এক পাতার ছোট একটি রচনা লেখ। তারপর সবার লেখাগুলো নিয়ে একটি দেয়ালে পাশাপাশি লাগিয়ে বানিয়ে ফেল পর্যটকদের দেয়াল পত্রিকা। দেয়াল পত্রিকাটি বিদ্যালয়ের এমন কোনো দেয়ালে টানিয়ে দাও যেখান থেকে চাইলে সবাই পত্রিকাটি পড়তে পারবে।

পর্যটকদের দেয়াল পত্রিকা

তো আমরা যে কথাটি বলছিলাম। সুলতানি আমলে বিদেশ থেকে আগত কয়েকজন পর্যটকের লেখা থেকে ওই সময়ের অর্থনৈতিক অবস্থার কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। এই পর্যটকদের মধ্যে রয়েছেন মার্কো পোলো, ইবনে বতুতা, ওয়াসফ, ভারথেমা প্রমুখ। তাদের লেখা থেকে জানা যায়, সে-সময়ের প্রধান রপ্তানি পণ্য ছিল কৃষিজাত পণ্য, কাপড় এবং মশলা। প্রধান কৃষিজ পণ্যের মধ্যে ছিল ধান, গম, আখ, ডাল, নারিকেল, সরিষা ইত্যাদি। সাধারণ মানুষদের অধিকাংশই কৃষির উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করত। সাধারণত নদী ও পানীয় জলাধারের পাশের বৃহৎ অঞ্চলজুড়ে কৃষিকাজ হতো যাতে সেচ সুবিধা পাওয়া যায়। সুলতানি আমলে উৎপাদিত তুলা থেকে যে বস্ত্র তৈরি হতো তা সারাবিশ্বে সমাদৃত ছিল। বাংলা অঞ্চলের মসলিনের খ্যাতি ছিল অবিস্মরণীয়। ইবনে বতুতা সুলতানি আমলে বাংলার ভূয়সী প্রসংশা করেছেন। তাঁর মতে বাংলায় যত সস্তায় জিনিসপত্র কিনতে পাওয়া যেত, তা পৃথিবীর অন্য কোথাও পাওয়া যেত না। কিন্তু সস্তায় জিনিসপত্র কেনার মতো সামর্থ্য কতজনের ছিল তা অবশ্য কোনো পর্যটকের লেখায় পাওয়া যায় না। সুলতানি আমলে লেনদেনের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মুদ্রা প্রচলিত ছিল। সে-সময়ে সোনা, রূপা এবং তামার পয়সার প্রচলন ছিল। তামার পয়সাকে বলা হতো জিতল। তবে সাধারণ মানুষ কড়ির মাধ্যমে বিনিময় করত। সমাজে শ্রেণিবৈষম্য প্রকট ছিল। সমাজের একদিকে যেমন বিত্তবানদের বিলাসী জীবন, ঠিক তেমনি উল্টো দিকে সংগামী মানুষ দুমুঠো খাবারের জন্য দিনরাত পরিশ্রম করত।

স্থাপত্যরীতিতে মিশ্রণ ও নতুনত্ব

উপমহাদেশের ইতিহাসে সুলতানি আমলের স্থাপত্য, শিল্প এবং সংস্কৃতি অনেক নতুন কিছুর সাথে পরিচয় ঘটায়। সুলতানদের আগমন এবং সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে ইন্দো-ইসলামি রীতির অনুসরণে স্থাপত্য শিল্পের অসাধারণ বিকাশ আমরা দেখতে পাই। এসময় সিরিয়া, বাইজান্টাইন, মিশর ও ইরানের স্থাপত্যরীতির সাথে ভারতীয় উপমহাদেশের স্থানীয় স্থাপত্যরীতির সংমিশ্রণে নতুন একটি ধারা বিকশিত হতে শুরু করে। এই রীতিকে মডেল হিসেবে ধরে কোটলা, ফিরোজ শাহ, হিসার ফিরোজ, ফতেহাবাদ, জৈনপুর প্রভৃতি শহর নির্মিত হয়। দিল্লীর কুতুব মিনার, ফিরোজ শাহ কোটলা, তুঘলকাবাদ দুর্গ, আলাউদ্দিন খিলজির মাদ্রাসা, পান্ডুয়ার আদিনা মসজিদ, বাগেরহাটের ষাটগম্বুজ মসজিদ, খান জাহাস আলীর সমাধি, গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদ, বড় সোনা মসজিদ ইত্যাদি স্থাপনা আজও সুলতানি আমলের স্থাপত্য হিসেবে ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে রয়েছে। চলো তবে আমরা সুলতানি আমলের কিছু স্থাপনার ছবি দেখে আসি।

সুলতানি স্থাপত্য : দিল্লীতে অবস্থিত ফিরোজ শাহ কোটলা

সুলতানি স্থাপত্য : গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদ যা বর্তমানে চাপাইনবাবগঞ্জে অবস্থিত।

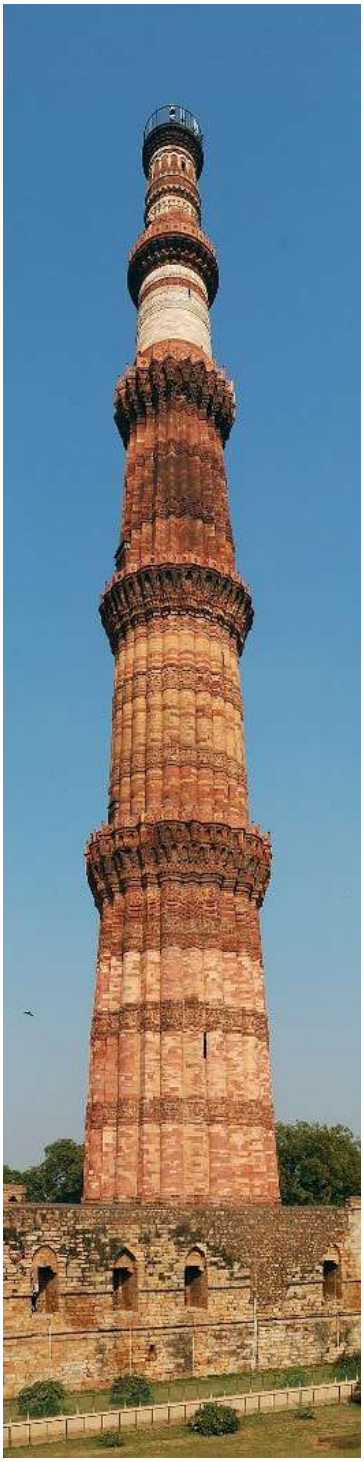

লতানি আমলের স্থাপত্য : দিল্লীতে অবস্থিত ইট দিয়ে নির্মিত বিশ্বের সর্ববৃহৎ মিনার ‘কুতুব মিনার’।

সুলতানি স্থাপত্য : সুলতান ইলতুৎমিশের সমাধি

সুলতানি স্থাপত্য : দিল্লীতে অবস্থিত গিয়াস উদ্দিন তুঘলকের সমাধি

সুলতানি স্থাপত্য : পশ্চিমবঙ্গের মালদহতে অবস্থিত আদিনা মসজিদ

সুলতানি স্থাপত্য : তুঘলকাবাদ দুর্গ

বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ

বাংলাদেশে থাকা সুলতানি আমলের অনবদ্য একটি স্থাপনা বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ। এর গায়ে কোনো শিলালিপি না থাকলেও এর স্থাপত্যরীতি দেখে ধারণা করা হয় আনুমানিক ১৫ শতাব্দিতে খান জাহান আলী এই মসজিদটি নির্মাণ করেন। ১৯৮৫ সালে প্রাচীন এই মসজিদটিকে ইউনেস্কো 'বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান' হিসেবে ঘোষণা করে। মজার বিষয় হলো, মসজিদটির নাম ষাট গম্বুজ মসজিদ হলেও সত্যিকার অর্থে এতে মোট ৮১টি গম্বুজ রয়েছে।

সুলতানি স্থাপত্য : বাগেরহাটের বিখ্যাত ষাট গম্বুজ মসজিদ